

আর-রাহীকুল মাখতুম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিদায় হজ্জ (حَجَّةُ الْوَدَاعِ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

বিদায় হজ্জ

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্বে অস্বীকৃতি এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর পয়গম্বরের ভিত্তির উপর এক নতুন সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর নিকট আভাষ দেয়া হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের সময় কাল ফুরিয়ে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ)–কে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন দশম হিজরী সনে। তখন তাঁর বিদায় কালে অন্যান্য উপদেশাবলীর সঙ্গে এ কথাও বললেন,

(يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَىٰ أَلَّا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي)

‘হে মোয়ায! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাত নাও হতে পারে, তখন হয়ত বা আমার এ মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে তোমরা যাতায়াত করবে।’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর মুখ থেকে মোয়ায (রাঃ) এ কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নাবী কারীম (ﷺ)–কে ইসলামী দাওয়াতের কার্যকারিতা এবং সুফল বাস্তবক্ষেত্রে দেখিয়ে দেবেন। এ দাওয়াতের কাজেই নাবী কারীম (ﷺ) অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন এবং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁর এ অসাধারণ সাফল্যমন্ডিত কর্মকান্ডের অন্তিম পর্যায়ে এটাই সুসঙ্গত হবে যে, হজ্জের মৌসুমে যখন মক্কার পার্শ্ববর্তী আরব গোত্র সমূহের সদস্য ও প্রতিনিধিগণ একত্রিত হবেন তখন তাঁরা রাসূলে কারীম (ﷺ)–এর নিকট থেকে দ্বীনের আহবান এবং শরীয়তের বিধানসমূহ নেবেন এবং নাবী কারীম (ﷺ) তাঁদের নিকট থেকে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাঁদের নিকট আল্লাহর পবিত্র আমানত যথার্থভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সেই ঐতিহাসিক হজ্জে মকবুলের জন্য তাঁর ইচ্ছা এবং কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তখন আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর পদচিহ্নকে নিজ নিজ চলার পথে একমাত্র আকাজক্ষিত ও অনুসরণযোগ্য বা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন।[1]

অতঃপর যূল ক্বা‘দাহ মাসের ৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার দিবস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।[2]

তিনি চুলে চিরুনী ব্যবহার করলেন, তেল মালিশ করলেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলেন, কুরবানীর পশুগুলোকে মালা বা হার পরালেন এবং যুহর সালাতের পর রওয়ানা হয়ে গেলেন। আসরের পূর্বে যুল হোলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে আসরের দু' রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং শিবির স্থাপন ক'রে সারারাত সেখানে অবস্থান করলেন। সকাল বেলা তিনি সাহাবীদের (রাযি.) বললেন,

(أَتَانِي اللَّيْلَةُ أَتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)

আজ রাতে আমার প্রভুর পক্ষ হতে একজন আগন্তুক এসে বলেছেন, 'এ পবিত্র উপত্যকায় সালাত আদায় কর এবং হজ্জের সঙ্গে ওমরা সংশ্লিষ্ট রয়েছে।[3]

অতঃপর যুহরের সালাতের পূর্বে নাবী কারীম (ﷺ) ইহরামের জন্য গোসল করলেন। এরপর আয়িশা (রাঃ) রাসূল (ﷺ)-এর শরীর এবং পবিত্র মাথায় নিজ হাতে যারীরা এবং মেশক মিশ্রিত এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য মালিশ করে দিলেন। সুগন্ধির রেশ নাবী (ﷺ)-এর মাথার সিঁথি এবং দাড়িতে পরিলক্ষিত হল, কিন্তু তিনি সেই সুগন্ধি না ধুয়ে তা স্থায়ীভাবে রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি লুঙ্গি পরিধান করেন, চাদর গায়ে দেন এবং যুহরের দু' রাকাত সালাত আদায় করেন।

এরপর সালাতের স্থানে একই সঙ্গে হজ্জ এবং উমরাহর ইহরাম বেঁধে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। ইহরাম বাঁধার পর বাহিরে এসে 'ক্বাসওয়া' নামক উটের উপর আরোহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অতঃপর উটে আরোহণ ক'রে ফাঁকা ময়দানে আগমন করেন এবং সেখানেও উচ্চ কণ্ঠে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

অতঃপর মক্কা অভিমুখে ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। সপ্তাহ কালব্যাপী পথ চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কার নিকটবর্তী যী'তাওয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন যাত্রা বিরতি করে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন এবং ফজরের সালাত আদায়ের পর গোসল করলেন। অতঃপর সকাল নাগাদ মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিবসটি ছিল ১০ম হিজরীর ৪ঠা যুল হিজ্জাহ রবিবার। পথে তিনি আট রাত কাটান, মধ্যমভাবে এ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য এ সময়েরই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

মাসজিদুল হারামে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথমে কা'বা গৃহের তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাযী করেন। কিন্তু ইহরাম ভঙ্গ করেননি। কারণ, হজ্জ এবং ওমরার জন্য তিনি একই সঙ্গে ইহরাম বেঁধে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে হাদয়ীও (কুরবানীর পশু) ছিল। তাওয়াফ ও সাযী সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কার উপরিভাগে হাজুন নামক স্থানের পাশে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার হজ্জের তাওয়াফ ছাড়া আর অন্য কোন তাওয়াফ করেননি। সাহাবাগণের মধ্যে যাঁরা কুরবানীর পশু (হাদয়ী) সঙ্গে নিয়ে আসেন নি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে নিজ নিজ ইহরাম ওমরায় পরিবর্তন করে নিতে এবং বায়তুল্লাহ (রাঃ) তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সাযী সম্পন্ন করে নিয়ে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে হালাল হচ্ছিলেন না সেহেতু সাহাবীগণ এ ব্যাপারে ইতস্তত করেছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ)

'আমি যা পরে জানলাম আমার ব্যাপারে আমি যদি তা আগেই জানতে পারতাম তাহলে আমি সঙ্গে হাদয়ী আনতাম না। তাছাড়া, আমার সঙ্গে যদি হাদয়ী না থাকত তাহলে আমি হালাল হয়েও যেতাম।'

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর যাঁদের সঙ্গে হাদয়ী ছিল না তাঁরা নাবী কারীম (ﷺ)–এর নির্দেশ মেনে নিয়ে হালাল হয়ে গেলেন।

যুল হিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখে তারবিয়ার দিন নাবী কারীম (ﷺ) মিনায় গমন করেন এবং তথায় ৯ই যুল হিজ্জাহর সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেখানে যখন পৌঁছেন তখন ওয়াদীয়ে নামেরায় তাঁবু প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানে তিনি অবতরণ করলেন। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে গেল তখন নাবী কারীম (ﷺ)–এর নির্দেশে কাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হল। এরপর তিনি বাতনে ওয়াদীতে গমন করলেন। ঐ সময় নাবী (ﷺ)–এর সঙ্গে ছিলেন এক লক্ষ চল্লিশ কিংবা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের এক বিশাল জনতার ঢল। এ বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক এবং মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন,

(أَيُّهَا النَّاسُ، اِسْمَعُوا قَوْلِي، فَإِنِّي لَا أُدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا)

‘ওহে সমবেত লোকজনেরা! আমার কথা শোন। কারণ, আমি জানি না এরপর আর কোন দিন তোমাদের সঙ্গে এ স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা।[4]

(إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أُضْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلْتُهُ هَذَا - وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رَبَا أُضْعُ مِنْ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ).

তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ধন সম্পদ অন্যদের জন্য এমনিভাবে হারাম যেমনটি তোমাদের আজকের দিন, চলতি মাস এবং এ বরকতপূর্ণ শহরের হুরমত রয়েছে। শুনে রাখো, অন্ধকার যুগের প্রত্যেকটি রেওয়াজ রসম আমার পদতলে পিষ্ট হয়ে গেল। জাহেলিয়াত যুগের শোণিত প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমাদের রক্তের মধ্যে প্রথম রক্ত যা আমি নিঃশেষ করছি তা হচ্ছে রাবী’আহ বিন হারিসের ছেলের রক্ত। এ সন্তান বনু সা’দ গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল এমন সময় হুজাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। অন্ধকার যুগের সুদ শেষ করা হল এবং আমাদের সুদের মধ্যে প্রথম সুদ যা আমি শেষ করছি তা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সুদের সকল প্রকার কাজ কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হল।

(فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْطِنَنَّ فَرِشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

হ্যাঁ, মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য হল তারা তোমাদের বিছানায় এমন কোন ব্যক্তিকে আনতে দেবে না যারা তোমাদের সহ্যের বাইরে হবে। যদি তারা এরূপ কোন অন্যায় করে বসে তাহলে তাদেরকে তোমরা মারধর করতে পারবে। কিন্তু গুরুতরভাবে আঘাত করবে না। তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হল তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়াবে ও পরাবে।

(وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللَّهِ).

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা শক্ত করে ধরে রাখলে তোমরা কখনোও পথহারা হবে না এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।[5]

(أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا أَمَّةَ بَعْدَكُمْ، أَلَا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ، وَتَحْجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، وَأَطِيعُوا أَوْلِيَاءَ أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ)

হে লোকজনেরা! স্মরণ রেখ আমার পরে আর নাবী আসবে না। কাজেই তোমাদের পরে অন্য কোন উম্মতের প্রশ্নও থাকবে না। অতএব, আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমায়ান মাসে রোযা রেখো, সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করো, নিজ প্রভুর ঘরের হজ্জ পালন করো এবং সৎ নেতৃত্বের অনুসরণ করো। নিষ্ঠার সঙ্গে এ সব কাজ করলে ওয়াদা মোতাবেক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[6]

(وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟)

আমার সম্পর্কে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তোমরা কী উত্তর দিবে?

সাহাবীগণ বললেন, ‘আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন, ইসলামী দাওয়াতের যে আমানত আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছিল তা যথাযথ ভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য কল্যাণ কামনার হক্ক আদায় করেছেন।

সাহাবীগণ (রাযি.)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাহাদত আঙ্গুলটি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং মানুষের দিকে তা নুইয়ে দিয়ে তিন বার বললেন,

(اللهم اشْهَدْ) (اللهم اشْهَدْ) (اللهم اشْهَدْ)

‘হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষ্য থাক।[7]

নাবী কারীম (ﷺ)-এর বাণীসমূহকে রাবী‘আহ বিন উমাইয়া বিন খালফ উচ্চৈঃস্বরে লোকজনদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছিলেন।[8] রাসূলে কারীম (ﷺ) যখন তাঁর ভাষণ হতে ফারোগ হলেন তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة: 3]

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি‘মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।’ [আল-মায়িদাহ (৫) : ৩]

এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই উমার (রাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ‘আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমরা এতো দিন ধীনের বৃদ্ধিই দেখছিলাম। এখন যেহেতু তা পূর্ণতা লাভ করলো সেহেতু পূর্ণতার পর তো তাতে আবার কেবল ঘাটতিই দেখা দিতে থাকে।[9]

নাবী কারীম (ﷺ)-এর ভাষণের পর বিলাল (রাঃ) প্রথমে আযান এবং পরে ইকামত বললেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। এরপর বিলাল (রাঃ) অবারও ইকামত করলেন। এ দু’ সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত পড়লেন না। এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবস্থান স্থলে গমন করলেন। নিজ উট ক্রাসওয়ার পেট পাথর সমূহের দিকে করলেন এবং হাবলে মুশাতকে (পদদলে যাতায়াতকারীগণের পথের

মাঝে অবস্থিত স্তম্ভ) সামনে করলেন এবং কিবলাহুমুখী হয়ে নাবী কারীম (ﷺ) (একই অবস্থায়) অবস্থান করলেন। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করলেন। সূর্যের অল্প অল্প হলুদ বর্ণ শেষ হল, আবার সূর্য মন্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উসামা (রাঃ)-কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং মুযদালিফায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুযদালিফায় মাগরিব এবং এশার সালাত এক বৈঠকে দু' ইকামতের সঙ্গে আদায় করলেন। মধ্যে কোন নফল সালাত আদায় করেননি। এরপর নাবী কারীম (ﷺ) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমে কাটালেন। তবে সকাল হওয়া মাত্র আযান এবং ইকামত দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ক্বাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে মাশয়ারে হারামে আগমন করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও তাওহীদের বাণীসমূহ উচ্চারণ করলেন। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর পিছনে বসিয়েছিলেন ফাযল বিন আব্বাস (রাঃ)-কে। বাতনে মোহাসসারে গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন সাওয়ারীকে একটু দ্রুত খেদালেন।

আর মধ্যের পথ দিয়ে যা জামরায়ে কুবরার দিকে বের হয় সে পথ ধরে জামরায়ে কুবরার নিকট গিয়ে পৌঁছেন। ঐ সময় সেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। এ বৃক্ষটির জন্যও জামরায়ে কুবরা প্রসিদ্ধ ছিল। তাছাড়া জামরায়ে কুবরাকে জামরায়ে 'আক্বাবাহ এবং জামরায়ে উলাও বলা হয়। নাবী কারীম (ﷺ) জামরায়ে কুবরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। কংকরগুলো আকারে এ রকম ছোট ছিল যে সেগুলোকে চিমটিতে ধরে নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল। নাবী কারীম (ﷺ) বাতনে ওয়াদী হতে দাঁড়িয়ে কংকরগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) কুরবানী স্থানে গিয়ে তাঁর মুবারক হাত দ্বারা ৬৩টি উট যবেহ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশক্রমে আলী (রাঃ) ৩৭টি উট যবেহ করেন। এভাবে এক শতটি উট কুরবানী করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলী (রাঃ)-কে তাঁর কুরবানীতে শরিক করে নেন। এরপর নাবী কারীম (ﷺ) এর নির্দেশে প্রত্যেকটি যবেহকৃত পশু হতে এক একটি অংশ কেটে নিয়ে রান্না করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং আলী (রাঃ) এ মাংস খান এবং ঝোল পান করেন।

অতঃপর আপন সাওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা গমন করেন। মক্কা পৌঁছার পর তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে ইফাযা বলা হয়। তাওয়াফ শেষে যুহর সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে জমজম কূপের নিকট বনু আব্দুল মুত্তালিবের পাশে গমন করেন। তাঁরা হাজীদেরকে জমজমের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি বলেন,

(انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يُغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سَفَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ)

‘বনু আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি উত্তোলন কর। যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে পানি পান করানোর কাজে লোকজন তোমাদেরকে পরাজিত করে ফেলবে, তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে পানি উত্তোলন করতাম। অর্থাৎ যদি সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পানি উত্তোলন করতে দেখতেন তাহলে সাহাবীগণ নিজেরাই পানি উত্তোলনের চেষ্টা করতেন। এভাবে হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদা ও সৌভাগ্য বনু মুত্তালিবেরই রয়ে গেল। অন্যথায় এ ব্যবস্থা তাঁদের আয়ত্বে আর থাকত না। কাজেই, বনু আব্দুল মুত্তালিব নাবী কারীম (ﷺ)-কে এক বালতি পানি উঠিয়ে দিলে তিনি তা হতে ইচ্ছানুযায়ী পান করলেন।[10]

দিনটি ছিল যুল হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন। এ দিবস সূর্য কিছুটা উপরে উঠল (চাশতের সময়)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণদানকালে তিনি খচ্চরের উপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন এবং আলী (রাঃ) তাঁর বাণীসমূহ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে শুনিতে দিচ্ছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবা (রাঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছিলেন দণ্ডায়মান অবস্থায়। [11] অদ্যকার ভাষণে নাবী কারীম (ﷺ) গত কালকের ভাষণের কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি করেন। সহীহুল বুখারী এবং সহীহুল মুসলিমে আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ১০ই যুল হিজ্জাহ কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ভাষণে আমাদের নিকট বলেন,

إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ، ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَشَعْبَانَ

‘আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় সে দিনের প্রকৃতিতেই পৌঁছেছে যে দিন আসমান ও জমিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বার মাসে বছর হয়, যার মধ্যে চার মাস হল হারাম মাস। ক্রমাগতভাবে তিন অর্থাৎ যিকা’দাহ, যুল হিজ্জাহ এবং মুহাররম এবং একটি রজব মুযার যা জুমাদাল আখিরাহ এবং শাবানের মাঝে অবস্থিত।’

অতঃপর নাবী জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) ভাল জানেন।’ এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ﷺ) নীরব থাকেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর নাম অন্য কিছু রাখবেন। কিন্তু তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ মাসটি কি যুল হিজ্জাহ নয়?’ আমরা বললাম, ‘তা কেন হবে না?’ এর পর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, ‘এ শহরটি কোন্ শহর?’ আমরা বললাম, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।’ নাবী কারীম (ﷺ) নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে এর নাম হয়তো অন্য কোন কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, ‘এ শহর কি মক্কা নয়?’ আমরা বললাম তা কেন হবে না? অর্থাৎ অবশ্যই তা। নাবী কারীম (ﷺ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা তবে এ দিবসটি কোন্ দিবস?’ আমরা বললাম, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।’ এতে তিনি নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে, এর নাম হয়তো অন্য কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, ‘এ দিনটি কি কুরবানীর দিন নয়?’ অর্থাৎ ১০ই যুল হিজ্জাহ নয়? আমরা বললাম অবশ্যই। তিনি বললেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

‘তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত পরস্পর পরস্পরের নিকট এমন পবিত্র তোমাদের এ শহর এবং তোমাদের এ মাস তোমাদের আজকের দিন যেমন পবিত্র।

وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟)

তোমরা অতি শীঘ্রই আপন প্রতিপালক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন। অতএব, স্মরণ রেখো যেন আমার পরে পুনরায় পশ্চাদমুখীনতা অবলম্বনের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা হয়ে না যাও। অধিকন্তু তোমরা এমন কোন কাজে লিপ্ত হবে না যার ফলে পরস্পর পরস্পরের গ্রীবা কর্তন করবে। বল! আম কি তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছে?

সাহাবীগণ বললেন, ‘হ্যাঁ, অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعِي مِنْ سَامِعٍ)

‘হে আল্লাহ সাক্ষী থাক’ যারা এখানে উপস্থিত তাদের কর্তব্য হবে অনুপস্থিতদের নিকট এ কথাগুলো পৌছে দেয়া কারণ ঐ অনুপস্থিতদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক থাকবে যারা এ উপস্থিত লোকদের কিছু সংখ্যকের তুলনায় দীন সম্পর্কে অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।[12]

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এ ভাষণে নাবী কারীম (ﷺ) এ কথাও বলেছিলেন,

(أَلَا لَا يَجْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَيْسُ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَفِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَسَيَرْضَى بِهِ)

স্মরণ রেখো! কোন অপরাধী নিজ অপরাধের দোষ অন্যের উপর আরোপ করতে পারবে না। (অর্থাৎ অপরাধের শাস্তি অপরাধীকে নিজেকেই ভোগ করতে হবে। অপরাধের জন্য নিজেকেই গ্রেফতার হতে হবে)। আরও স্মরণ রেখো! পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। স্মরণ রেখো! শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে এ কারণে যে, এখন থেকে তোমাদের এ শহরে আর কখনো তার পূজা করা হবে না। কিন্তু যে সব অন্যায় কাজকে তোমরা খুব তুচ্ছ মনে করবে ওতেই তার অনুসরণ করা হবে এবং সে তাতেই সন্তুষ্ট হবে।[13]

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ১১, ১২, ও ১৩ যুল হিজ্জাহ (আইয়ামে তাশরীক) মীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হজ্জের নিয়ম কানুন পালন করতে থাকেন এবং লোকজনকে শরীয়তের আহবানগুলো শিক্ষা দিতে থাকেন ও আল্লাহর যিকির করতে থাকেন। অধিকন্তু ইবরাহীমী রীতিনীতির সুনানে হাদীসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন এবং শিরকের নিশানগুলো নিশ্চিহ্ন করতে থাকেন। নাবী কারীম (ﷺ) আইয়ামে তাশরীকেও ভাষণ প্রদান করেন। সুনানে আবী দাউদে হাসান সনদে বর্ণিত আছে সারায় বিনতে নাবহান (রাঃ) বলেন যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে রউসের দিন ভাষণ দেন।[14] তিনি বলেন, (إِنِّي أُنَبِّئُكُمْ أَنَّ هَذَا أَوَسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) ‘এটা আইয়ামে তাশরীকের মধ্য দিবস নয় কি?’[15] নাবী কারীম (ﷺ) –এর আজকের ভাষণও গতকালের ভাষণের অনুরূপ ছিল। এ ভাষণ দেয়া হয়েছিল সূরাহ নাসর নাজিল হওয়ার পর। আইয়ামে তাশরীকের শেষে, দ্বিতীয় ইয়াওমুন নাফারে অর্থাৎ ১৩ই যুল হিজ্জাহ তারিখে নাবী কারীম (ﷺ) মীনা হতে রওয়ানা হয়ে যান এবং ওয়াদীয়ে আবতাহ এর খাইফে বনু কিনানাহয় অবস্থায় করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রি তিনি তথায় অতিবাহিত করেন এবং যুহর সালাত, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত সেখানেই আদায় করেন। এশার সালাত শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ গমন করেন এবং তাওয়াফে বিদা’ আদায় করেন।

সকল মানুষ যখন হজ্জ (হজ্জের নিয়মাবলী) হতে ফারেগ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপন সওয়ারীকে মদীনা মনোয়ারাভিমুখী করলেন। তাঁর মদীনামুখী হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে আরাম আয়েশে গা ঢেলে দেয়া নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে আর এক নবতর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া।[16]

- [1] এ কথাটি সহীহুল মুসলিমে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। নাবী কারীম (সাঃ)-এর হজ্জ পর্ব দ্রষ্টব্য। ১ম খন্ড ৩৯৪ পৃঃ।
- [2] হাফিয় ইবনু হাজার (রহঃ) এর উত্তমরূপে তাহকীক করেছেন। কোন বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে যী কা'দার পাঁচ দিন অবশিষ্ট ছিল তখন নাবী (সাঃ) যাত্রা করেন। এর সংশোধনও করেছেন দ্র: ফাতহুল বারী ৮ম খন্ড ১০৪ পৃঃ।
- [3] উমার (রাঃ) হতে বুখারী শরীফে এটা বর্ণিত হয়েছে ১ম খন্ড ২০৭ পৃঃ।
- [4] ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ৬০৩ পৃঃ,
- [5] সহীহুল মুসলিম নাবীর হজ্জের অধ্যায় ১ম খন্ড ৩৯৭ পৃঃ।
- [6] ইবনু মাজা, ইবনু আসাকের, রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খন্ড ২২৩ পৃঃ।
- [7] সহীহুল মুসলিম ১ম খন্ড ৩৯৭ পৃঃ।
- [8] ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ৬০৫ পৃঃ।
- [9] বুখারী ইবনু উমার হতে দ্র: রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খন্ড ২৬৫ পৃঃ।
- [10] মুসলিম, জাবির হতে, নাবী কারীম (সাঃ)-এর হজ্জ অধ্যায় ১ম খন্ড ৩৯৭-৪০০ পৃঃ।
- [11] আবু দাউদ, কুরবানীর দিন কোন্ সময়ে তিনি খুৎবা দিয়েছিলেন সে অধ্যায় ১ম খন্ড ২৭০ পৃঃ।
- [12] সহীহুল বুখারী, মীনার ভাষণ অধ্যায় ১ম খন্ড ২৩৪ পৃঃ।
- [13] তিরমিযী ২য় খন্ড ১৬৫ পৃঃ। ইবনু মাজাহ হজ্জ পর্ব, মিশকাত ১ম খন্ড ২৩৪ পৃঃ।
- [14] অর্থাৎ ১২ই ফিলজহজ্জ (আউনুল মাবুদ ২য় খন্ড ১৪৩ পৃঃ।
- [15] আবু দাউদ মীনায় কোন দিন ভাষণ দেন। ১ম খন্ড ২৬৯ পৃঃ।
- [16] বিদায়ী হজ্জের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সহীহুল বুখারী মানাসিক পূর্ব ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড ৬৩১ পৃঃ, সহীহুল মুসলিম নাবী কারীম (সাঃ)-এর হজ্জ অধ্যায় ফাতহুল বারী ৩য় খন্ড মানাসিক পর্বের ব্যাখ্যা ৮ম খন্ড ১০৩-

১১০ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ৬০১-৬০৫ পৃঃ।, যাদুল মা'আদ ১ম খন্ড ১৯৬ এবং ২১৮-২৪০ পৃঃ।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6451>

হাদিসবিভিন্ন প্রজেক্টে অনুদান দিন